বাংলাদেশের সাহসী সন্তান

রাগিব হাসান

ragibhasan@gmail.com http://www.ragibhasan.com

ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকান্ডে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে অগ্রগামী ছিলো বাঙালিরাই। আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে, পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা। উইকিপিডিয়াতে এই সব বিপ্লবীদের জীবনী লিখতে গিয়ে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করি। যুগান্তর নামে যে বিপ্লবী দল গঠিত হয়, তার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিলো এই পূর্ববঙ্গেই।

এই সাহসী বিপ্লবীদের একজন, বিনয় বসুর জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জে। বাংলা উইকিপডিয়াতে তাঁর জীবনী নিবন্ধটি নীচে তুলে ধরলাম। লেখাটি বাংলা উইকিপিডিয়া হতে মুক্ত লাইসেন্সে (জিএফডিএল) প্রদত্ত।

বিনয় বসু

বিনয় কৃষ্ণ বসু, বিনয় বসু নামে বেশি পরিচিত (জন্ম সেপ্টেম্বর ১১, ১৯০৮, মৃত্যু ডিসেম্বর ১৩, ১৯৩০), ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিরোধী বাঙালি বিপ্লবী।

প্রাথমিক জীবন

বিনয় বসুর জন্ম হয় ১৯০৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর, মুন্সিগঞ্জ জেলার রোহিতভোগ গ্রামে। তাঁর পিতা রেবতীমোহন বসু ছিলেন একজন প্রকৌশলী। ঢাকায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করার পর বিনয় মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল (বর্তমানের স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ) এ ভর্তি হন। এসময় তিনি ঢাকার ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং যুগান্তর দল এর সাথে জড়িত মুক্তি সঙ্ঘে যোগ দেন। বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার জন্য তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর পড়ালেখা শেষ করতে পারেননি।

বিপ্লবী কর্মকান্ড

বিনয় ও তাঁর সহযোদ্ধারা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে যোগ দেন ১৯২৮ সালে। অল্পদিনের মধ্যেই বিনয় এই সংগঠনের ঢাকা শাখা গড়ে তুলেন। অচিরেই রাজবন্দীদের উপর পুলিশী নির্যাতনের বিরূদ্ধে তাঁর সংগঠনটি রুখে দাঁড়ায়। ১৯৩০ সালে বিপ্লবীরা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। লোম্যানের মিটফোর্ড হাসপাতালে এক সহকর্মীকে দেখতে আসার কথা ছিল। ১৯৩০ সালের ২৯ আগস্ট বিনয় সাধারণ বেশভূষায় নিরাপত্তা গন্ডীকে ফাঁকি দিয়ে লোম্যানের খুব কাছে চলে এসে তাকে গুলি করেন। ঘটনাস্থলেই লোম্যানের মৃত্যু হয় এবং তাঁর সঙ্গে থাকা পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হডসন গুরুতর আহত হন।

পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে বিনয় কলকাতা শহরে পালিয়ে যান। পুলিশ তাঁকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ৫০০০ রূপি পুরষ্কার ঘোষণা করে।

রাইটার্স ভবনে হামলা

বিপ্লবীদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল কারা কর্তৃপক্ষের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এনএস সিম্পসন। রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য সিম্পসন বিপ্লবীদের কাছে কুখ্যাত ছিলেন। তাঁরা সিম্পসনকে হত্যার সাথে সাথে ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তদানিন্তন সচিবালয়ে - কলকাতা শহরের রাইটার্স ভবন (বর্তমানে বিবাদি বাগে অবস্থিত) - হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত

নেন।
১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিনয়, বাদল গুপ্ত ও দিনেশ গুপ্ত একত্রে মিলে ইউরোপীয় বেশ ভূষায় সজ্জিত হয়ে রাইটার্স ভবনে প্রবেশ করেন ও সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন।
ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী সাথে সাথে গুলি বর্ষণ শুরু করে। গুলি বিনিময়ে টেয়ানাম, প্রেন্টিস, নেলসন সহ আরো কিছু পুলিশ অফিসার গুলিবিদ্ধ হন। তবে অচিরেই তিন বিপ্লবী পরাভূত হন। পুলিশের কাছে ধরা না দেয়ার অভিলাসে বাদল গুপ্ত পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। বিনয় ও দিনেশ পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। হাসপাতালে ১৯৩০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর বিনয়ের মৃত্যু হয়।
বিনয়-বাদল-দিনেশের এই আত্মত্যাগের স্মরণে কলকাতার ডালহৌসি চত্বরের নাম করণ করা হয় বিবাদি বাগ।

গ্রন্থসূত্র

হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ভারতের বিপ্লব কাহিনী, ২য় ও ৩য় খন্ড, কলকাতা, ১৯৪৮।
আরসি মজুমদার, , , কলকাতা, ১৯৬৩।
গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, অবিস্মরণীয়, কলকাতা, ১৯৬৬

প্রফুল্ল চাকী

বিনয় বসুর জন্মের আগে পূর্ববঙ্গের আরো অনেকেই ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী। ক্ষুদিরামকে নিয়ে অনেক গান বাঁধা হয়েছে, কিন্তু সেই ক্ষুদিরামের সহযোগী প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে সেরকম খুব বেশী কিছু লেখা হয়নি।

বাংলা উইকিপিডিয়া থেকে নেয়া প্রফুল্ল চাকীর জীবনী তুলে ধরছি এখানে। নিবন্ধটি মুক্ত লাইসেন্সের অধীনে প্রদত্ত।

প্রফুল্ল চাকী (ডিসেম্বর ১০, ১৮৮৮ - ১৯০৮) ভারত উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। পূর্ববঙ্গে জন্ম নেয়া এই বাঙালী বিপ্লবী তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, এবং জীবন বিসর্জন করেন।

প্রাথমিক জীবন

প্রফুল্ল চাকীর জন্ম ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর বগুড়া জেলার বিহার গ্রামে (বর্তমানে যা বাংলাদেশের অন্তর্গত)। নবম শ্রেনীতে পড়ার সময় পূর্ব বঙ্গ সরকারের কারলিসল সার্কুলারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহনের দায়ে তাঁকে রংপুর জেলা স্কুল হতে বহিস্কার করা হয়। তিনি এর পর রংপুর ন্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনা করেন। সেখানে পড়ার সময় জীতেন্দ্রনারায়ণ রায়, অবিনাশ চক্রবর্তী, ঈশান চন্দ্র চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিপ্লবীর সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়, এবং তিনি বিপ্লবী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

বিপ্লবী কর্মকান্ড

বারীন ঘোষ প্রফুল্ল চাকীকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। যেখানে প্রফুল্ল যুগান্তর দলে যোগ দেন। তাঁর প্রথম দায়িত্ব ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলারকে (১৮৫৪-১৯৩৫) হত্যা করা। কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল হয় নাই। এর পর প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরাম বসুর সাথে কলকাতা প্রেসিডেন্সী ও পরে বিহারের মুজাফফরাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

মুজাফফরাবাদে অভিযান

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কিংসফোর্ডের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাকে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা বেলায় হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। ইউরোপিয়ান ক্লাবের প্রবেশদ্বারে তাঁরা কিংসফোর্ডের ঘোড়ার গাড়ির জন্য ওঁত পেতে থাকেন। একটি গাড়ি আসতে দেখে তাঁরা বোমা নিক্ষেপ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, বরং দুইজন ব্রিটিশ মহিলা মারা যান। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম তৎক্ষনাৎ ঐ এলাকা ত্যাগ করেন।

পলায়ন ও মৃত্যু

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম আলাদা পথে পালাবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রফুল্ল ছদ্মবেশে ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ট্রেনে নন্দলাল ব্যানার্জী নামে এক পুলিশ দারোগা সমস্তিপুর রেল স্টেশনের কাছে প্রফুল্লকে সন্দেহ করেন। ধাওয়ার সম্মুখীন হয়ে প্রফুল্লে পালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোণঠাসা হয়ে পড়ে প্রফুল্ল ধরা দেওয়ার বদলে আত্মাহুতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজের মাথায় পিস্তল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম পরবর্তীতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

প্রীতিলতার নাম নতুন করে বলার কিছু নেই। আমার নিজের শহর চট্টগ্রামের খাস্তগীর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী, ইডেন কলেজ হতে আইএ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্ট্যান্ড করা প্রীতিলতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিস্টিংকশন সহ বিএ পাস করে যোগ দেন চট্টগ্রামের অপর্ণাচরণ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে।

এই প্রীতিলতাই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাস্টারদা সূর্যসেনের সাথে যোগ দিয়ে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে অংশ নেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ হওয়া এই রমণীর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম রইলো।

প্রীতিলতার এই জীবনী নিবন্ধটি বাংলা উইকিপিডিয়া থেকে নেয়া এবং মুক্ত লাইসেন্সে প্রদত্ত।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) ভারত উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে জন্ম নেয়া এই বাঙালি বিপ্লবী তখনকার ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, এবং জীবন বিসর্জন করেন।

প্রাথমিক জীবন

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯১১ সালের ৫ই মে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহন করেন। চট্টগ্রামের ডাঃ খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাস করার পর ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৯ ইডেন কলেজ হতে আই.এ. তে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাসিক বিশ টাকা বৃত্তিতে কলকাতার বেথুন কলেজে পড়তে যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষায় ডিস্টিংশনসহ পাস করেন এবং চট্টগ্রামের নন্দন কানন অর্পণাচরণ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন।

বিপ্লবী কর্মকান্ড

ইডেন কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী সংগঠন 'দিপালী সঙ্ঘ'-র সাথে যুক্ত হন। বেথুন কলেজে ছাত্রীবস্থায় ছাত্রী সঙ্ঘ-র সক্রিয় কর্মী ছিলেন। চট্টগ্রামে বিপ্লবী দলের মেয়ে সদস্য ও ছাত্রীদের নিয়ে একটি চক্র গড়ে তোলেন। সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বোমা তৈরির খোল আনার দায়িত্ব দেয়া হয় প্রীতিলতার নেতৃত্বের চক্রকে। তারা সুটকেসে লুকিয়ে খোল নিয়া আসেন যা পরবর্তী বিপ্লবী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হয়। ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র ধলঘাটের ঘাঁটিতে সূর্যসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করলে সূর্যসেন ও প্রীতিলতা বাড়ির পেছন দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সেখানে বিপ্লবীদের সাথে বন্দুক যুদ্ধে বিপ্লবী নির্মলকুমার সেন নিহত হন। এর পরে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলে প্রীতিলতা এতে অংশগ্রহন করেন। চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাবের ফটকে লেখা ছিল কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ।

ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ এবং মৃত্যু

১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলে সূর্য সেন অভিযানের নেতৃত্ব প্রীতিলতাকে দেন। সেদিন রাতে তিনি সফলভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। সেই অভিযানে হতাহত হয় অনেক ইংরেজ নরনারী। আভিযানের শেষে ফেরার সময় আত্মগোপনকারী এক ইংরেজ তরুণের গুলিতে আহত হন। আহতাবস্থায় ধরা পড়ার চাইতে আত্মাহুতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পটাশিয়াম সায়ানাইড ভক্ষণ করে আত্মাহুতি দেন। তার মৃতদেহের পোশাকে নিজ হাতে লেখা বিবৃতিতে এক জায়গায় লেখা ছিল,

"আমরা দেশের মুক্তির জন্যে এই সশস্ত্র যুদ্ধ করিতেছি। অদ্যকার পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অংশ। ব্রিটিশরা জোর পূর্বক আমাদের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইয়াছে। ..... সশস্ত্র ভারতীয় নারী সমস্ত বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন- এই আশা লইয়া আমি আজ আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।"

উল্লাসকর দত্ত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সন্তান উল্লাসকর দত্ত বিংশ শতকের গোড়ার দিকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞানের স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। কিন্তু অন্য অনেক সুবিধাবাদীর মতো নিজের আখের গোছানোতে ব্যস্ত না হয়ে উল্লাসকর পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রামে যোগ দেন। উল্লাসকর দত্তের জীবনী, বাংলা উইকিপিডিয়া থেকে মুক্ত লাইসেন্সের অধীনে নেয়া।
উল্লাসকর দত্ত (১৮৮৫ - ১৯৬৫) একজন ব্রিটিশ বিরোধী বাঙালি বিপ্লবী কর্মী।

প্রাথমিক জীবন

উল্লাসকরের জন্ম হয় তদানিন্তন অবিভক্ত বাংলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালিকাছা গ্রামে। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এর ছাত্র ছিলেন, এবং পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। তবে কলেজে পড়ার সময় ইংরেজ অধ্যাপক রাসেল বাঙালিদের সম্পর্কে কটুক্তি করার দরুন উল্লস্কর তাঁকে আঘাত করেন, এজন্য উল্লাসকরকে কলেজ হতে বহিষ্কার করা হয়েছিলো।

বিপ্লবী কর্মকান্ড

উল্লাসকর যুগান্তর দলে যোগ দেন। তিনি বিস্ফোরক নির্মাণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯০৮ সালে তাঁর তৈরী বোমা ক্ষুদিরাম বসু ও হেমচন্দ্র দাস ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে আক্রমণে ব্যবহার করেছিলেন। তবে এই হামলা বানচাল হয়ে যায়, এবং পুলিশ উল্লাসকর দত্ত সহ যুগান্তর দলের অনেক সদস্যকে গ্রেফতার করে।

বিচার ও সাজা

আলীপুর বোমা মামলা নামের এই বিখ্যাত মামলায় উল্লাসকরকে শুরুতে ফাঁসীর আদেশ দেয়া হয়। তবে পরবর্তীতে এই সাজা রদ করে তাঁকে আন্দামান দ্বীপের জেলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেয়া হয়।

জেল খাটা

আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে উল্লস্কর দত্তকে শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে তিনি সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ১৯২০ সালে তাঁকে মুক্তি দেয়া হলে তিনি কলকাতা শহরে ফেরৎ আসেন।

পরবর্তী জীবন

উল্লাসকরকে পরে ১৯৩১ সালে আবারও গ্রেফতার করা হয়, ও ১৮ মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের পর তিনি গ্রামের বাড়ি কালিকাছাতে ফেরৎ যান। সেখানে একাকী ১০ বছর কাটানোর পর তিনি ১৯৫৭ সালে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, এবং সেখানেই ১৯৬৫ সালের ১৭ই মে মৃত্যুবরণ করেন।